**জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস**
**ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩**

# জীবন গঠনে নৈতিকতার গুরুত্ব: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আরিফা সুলতানা*

**Abstract**

Everyone living in a society naturally practices truthfulness, justice, charity, humanity etc, and at the same time tries to refrain from some immoral acts such as injustice, falsehood, and many sorts of inhuman activities. All of these human practices are mainly motivated by the urge to live a sound, peaceful and worthy life. Nevertheless, our societies are facing many moral degradations because of lacking the perfect moral codes to practice. Almost all the living religions in the world and the human doctrines in this regard generate a lot of guidelines. But these guidelines or standards of living are not always practised rightly. This paper is an endeavour to search for an effective and fruitful moral code for a good life. Here, there is an endeavour to show that Islamic moral teachings are sufficient to make an ideal life for everyone living in a society. The method of this research is mainly analytic and also deductive in some cases, especially in drawing conclusive results from some general principles.

**চাবিশব্দ:** নৈতিকতা, আদর্শজীবন, ধর্ম, ইসলাম, কুরআন, হাদিস, ন্যায়বিচার, বৈষয়িকজীবন

মানবজীবনের কল্যাণ চিন্তার সাথে বৈষয়িকজীবন যেমন সম্পর্কিত ঠিক তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলিও আদর্শজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। এমনকি বৈষয়িকজীবনকে সঠিকভাবে বা যথার্থভাবে পরিচালনা করতে হলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক হয়ে পড়ে। মানবজীবন সাধারণ জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর থেকে উচ্চতর। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ যেমন যৌক্তিকভাবে চিন্তা করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি পরিমাপ করে একটি বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও অগ্রসর হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আদর্শমানবজীবন বলতে আমরা এমন একটি জীবনকে বুঝি যে জীবন তার আবশ্যিক নিয়ামক হিসেবে যৌক্তিকতা ও নৈতিকতাকে চর্চা করে।

মানুষকে নৈতিক করে তোলার জন্য বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রকমের উপদেশ প্রদান করেছেন। দার্শনিকরা প্রদান করেছেন বিভিন্ন মানদণ্ড। কিন্তু এ সবেরও পুরোনো ঐতিহ্য হিসেবে আমরা ধর্মকে দেখতে পাই। মানব ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজ অবধি ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিকতার একটি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করছে। বিশেষকরে আমাদের পারিবারিক শিক্ষার সিংহভাগই ধর্মীয় নৈতিক নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আদর্শজীবনের পথে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে নৈতিকতার পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের যাত্রা পারিবারিকভাবে ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ছত্রছায়ায়ই যেহেতু সূচিত হয়, তাই এই পর্যায়টিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান জরুরি বলে মনে হয়। নৈতিক তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রেও ধর্ম দিক-নির্দেশনা দিয়ে আসছে। অর্থাৎ উন্নত মানবজীবনের জন্য কোনো মানদণ্ড নির্মাণের বিষয়ে যেসকল নৈতিক সূত্র প্রয়োজন হয় পৃথিবীতে আবির্ভূত প্রধান প্রধান

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

ধর্মগুলো সে ধরনের শিক্ষার পর্যাপ্ত পাঠই প্রদান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে এখানে ইসলাম ধর্মের কথা বলা যায়। এই ধর্মটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়– এ কারণে যে একটি আদর্শজীবন গঠণের সবধরণের নীতিমালাই এ ধর্ম প্রদান করে থাকে।

বর্তমান গবেষণায় আদর্শজীবন গঠনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকাকে চিহ্নিত করে ইসলামের ভিত্তিতে কীভাবে আদর্শজীবন গঠন করা যায় তার একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় বর্ণনামূলক অংশে আদর্শজীবন, নৈতিকতা, ইতিহাসের আলোকে মানুষের নৈতিক অভিযাত্রা এবং প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের আদর্শমানব গঠনের প্রচেষ্টাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের নৈতিক নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে উচ্চতর নৈতিকজীবন তথা আদর্শজীবন গঠন করা সম্ভব। গবেষণা-পদ্ধতি হিসেবে এখানে বিশ্লেষণমূলক ও মূল্যায়ণধর্মী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

নৈতিকতা বলতে সাধারণত একটি আচরণ বিধিকে বোঝায়। অন্য কথায় নৈতিকতা হলো নৈতিক চেতনা তথা সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ বিচারের বোধ। নৈতিকতা সামাজিক মানুষের বোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সত্যগুলোর ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টি। অর্থাৎ কাজ-কর্মে, কথাবার্তায় নীতি ও আদর্শের অনুশীলনই হলো নৈতিকতা। একটি সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার জন্য নৈতিকতা প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রতিটি সমাজ কাঠামোর ভিন্নতার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড চর্চা করতে দেখা যায়, এবং এ অর্থে নৈতিকতা অনেকটা আপেক্ষিক বিষয় বলে অনেকে মনে করে থাকেন। সকল সমাজে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের মানদণ্ডগুলোর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নতা থাকলেও এদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংগতিও লক্ষ করা যায়, যেমন– সত্যবাদিতা, পরোপকার, বিনয় ইত্যাদি সব সমাজেই কম-বেশি ভালো বলে মনে করা হয়। নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎসগুলির মধ্যে ধর্ম অন্যতম। প্রতিটি ধর্মের কিছু আদর্শ বা নির্দেশনা থাকে যার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা নৈতিকতা দ্বারা সমাজের মানুষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এমনকি মানুষের সামগ্রিক জীবনাচারের একটি বিরাট অংশ ধর্মীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। এ কারণে কোনো কোনো ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক মানুষকে বা মানব জাতিকে জানতে হলে ধর্মকে জানার আবশ্যকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই কেবল নৈতিকতা নয়, সমাজের সামগ্রিক জীবনাচার জানতে ধর্মীয় নীতি-আদর্শ জানা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তাই বলা যায় "…the study of man can never be complete unless it includes the study of religion, for there is no more widespread, impressive, or significant thing in his history than religion.।"[১]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা মানুষের আদর্শ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় বর্ণনা করে। কারণ মানুষের জীবনযাপন করা উচিত একটি মূল্যবোধ অনুযায়ী, আর ইসলাম ধর্ম মতে, যা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। পবিত্র কুরআন ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতাকে বিবেচনা করেছে যাতে মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা পেতে পারে। আর এই সব নির্দেশনা তাকে সুখের দিকে পরিচালিত করে যা নৈতিকতার চূড়ান্ত ফল হিসেবেও দেখা যায়। নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার পূর্বে নৈতিকতা সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের দর্শন কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মিশরীয়দের ধর্ম চিন্তায় পারলৌকিক চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। মিশরীয়দের বিশ্বাস মতে, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত ব্যক্তিকে তাঁর পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য দেবতা ওসাইরাসের (osirus) সামনে হাজির করা হয় এবং তিনটি পর্যায়ে এই বিচার নিষ্পত্তি করা হয়। মিশরীয়রা খুন, চুরি, মিথ্যাচার, লোভ, ক্রোধ, অহংকার, ব্যবসায় অসাধুতা প্রভৃতি ৪২টি অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পাপকাজ বলে বিবেচনা করে। এ ধর্মে দেবতাদের নির্দেশ মান্য করা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা, পিপাসার্তকে পানি পান করানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান করার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।[২] তাই দেখা যায়, এই ধর্ম বিশ্বাসে পরকালে সুখ লাভের জন্য পার্থিব জীবনের নৈতিক কর্মকাণ্ডকেই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পারস্যের ধর্মীয় প্রবক্তা জরথুস্ত্র (Zarathustra) পারসীয়দের কাছে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ধর্ম ও আদর্শের কথা প্রচার করেছেন। এই ধর্ম মতে, সৎ কাজকে পুণ্য এবং অহংকার, লোভ, আলস্য, ক্রোধ, কামপ্রবৃত্তি, ব্যাভিচার, গর্ভপাত, কুৎসা রচনা, মিথ্যাচার, অপব্যয় করা ইত্যাদি অসৎ কাজকে পাপ বলে বিবেচনা করা হতো। জরথুস্ত্রবাদ দৃঢ়ভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে। এই মতের অনুসারীগণ মনে করে, শেষ বিচারের দিনে মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে। পাপী ব্যক্তিরা স্বল্পকালের জন্য নরকবাসী হবে। অতঃপর সকলেই স্বর্গে বাস করবে।[৩]

ইহুদি ধর্মে একত্ববাদের কঠোর নির্দেশনার সাথে সাথে নৈতিক বিধি-নিষেধেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। এই ধর্মে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়ের পথে চলা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, এতিমের প্রতি দয়া করা এবং বিধবার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে।[৪]

খ্রিস্ট ধর্মে মানবপ্রীতি, অহিংসা এবং মানবসেবাকে অতি উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যীশু বলেন, অনন্ত জীবন পেতে হলে খুন করা, ব্যাভিচার করা, চুরি করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। পিতা-মাতাকে সম্মান করতে হবে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করতে হবে। তিনি ভ্রাতৃত্ব ও সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।[৫]

হিন্দু ধর্ম মতে, ভগবদগীতায় উপদেশ হচ্ছে ফল লাভের আশা ত্যাগ করে ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হবে। কর্মেই রয়েছে ব্যক্তিমানুষের অধিকার, কর্তব্য ও মুক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিস্কাম কর্মের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং দুনিয়ার মোহ-মায়া থেকে মুক্ত হয়ে নি:স্বার্থপূর্ণ কাজের মাধ্যমেই মোক্ষ বা মুক্তি রয়েছে বলে নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "Therefore always do without attachment the work you have to do; for a man who does his work without attachment attains the supreme."[৬] এই শিক্ষাই হলো গীতার মূল নৈতিক শিক্ষা।

চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস চীনাদের মধ্যে আদর্শ ও নৈতিক জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য Five Chings নামে পরিচিত পাঁচটি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো: প্রাচীন ঐতিহ্যকে মনোযোগের সাথে ধারণ করা; শিক্ষা অবারিত করা, সৎকর্মশীল হওয়া, পিতা-মাতা, পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সদয় হওয়া এবং নিজের জন্য অপছন্দ কোনো কাজ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকা।[৭]

সমতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবপ্রেম এবং অহিংসা ছিল গৌতম বুদ্ধের নৈতিকতার মূল বিষয়। বুদ্ধের বাণী হলো– 'অহিংসা পরম ধর্ম'। বুদ্ধ বাণীর সারকথা সর্বজনীন শান্তি, অহিংসা, প্রেম-ভালোবাসা,

পরমত সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং সর্বজীবে মৈত্রী। বুদ্ধের উপদেশাবলিতে এমন সব উপাদান আছে যা সর্বকালে সবলোকের জন্য প্রযোজ্য।[৮] কুশল কর্ম সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন, "সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা, কুশল সম্পাদন করা এবং স্বীয় চিত্ত শুদ্ধিকরণ ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন"।[৯]

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস এর মতে, জ্ঞানই বাস্তব, জ্ঞানই সত্য। তিনি সত্য লাভের জন্য মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে প্রত্যেকটি বস্তুকে বিচার করতে বলেছেন। তিনি মনে করেন, বিচার ক্ষেত্রে আবেগ বর্জন করতে হবে এবং বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সৎ কাজ করতে হবে। সক্রেটিসের নীতিতত্ত্বের মূল কথাই হলো 'জ্ঞানই পুণ্য'। জ্ঞান বা সত্য এবং সদগুণ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কেননা জ্ঞানই সকল সদাচরণের উৎস আর অমঙ্গল, পাপ ও মিথ্যাচার আসে অজ্ঞানতা থেকে। সক্রেটিস আরও বলেন, "নিজেকে জানো"। সক্রেটিস মনে করেন, বিবেকের অনুমোদন ছাড়া শুধু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা সৎ নাগরিকের বৈশিষ্ট্য নয়। তাই তিনি এথেন্সের যুবকদের খোলা ময়দানে ডেকে এনে নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন এবং তাদের সুন্দর ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবন-যাপনে উৎসাহিত করতেন। তিনি মনে করেন, পরিবার বা রাষ্ট্রের বিধান নয় নিজের বুদ্ধিবিবেচনায় যা সঠিক বলে মনে হবে, একজন জ্ঞানী নাগরিকের তা অনুসরণ করা কর্তব্য।[১০]

নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণের ক্ষেত্রে দার্শনিক প্লেটো ন্যায় ও শুভের অনপেক্ষ মর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সমাজের প্রতিটি সদস্যের পূর্ণমাত্রায় ন্যায়বিচার পাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতা, ঐক্য, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের প্রত্যেকের জীবন পূর্ণমাত্রায় বিকাশের ওপর জোড় দেন এবং নাগরিকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাই প্লেটো তাঁর *Republic* গ্রন্থে বলেন, রাষ্ট্রের প্রজাদের নৈতিক আদর্শে বলীয়ান করার চেষ্টা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রজাদের পবিত্র, সত্য ও মঙ্গলময় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে মর্যাদাশীল জাতি গঠনে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।[১১]

ইসলাম নতুন কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্ম অনুসারে, ইব্রাহিম (আঃ) ও ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবিগণ মানবতা ও নৈতিকতার বাণী প্রচার করে যে একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেন ইসলাম তারই পথ অনুসরণ করেছে। তবে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচারিত এই ধর্মের ছিল নতুন ব্যাখ্যা ও শক্তি। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মহান আল্লাহ্‌র বাণী ও তাঁর রাসুলের আদর্শই হলো নৈতিকতার উৎস। ইসলামে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিন্তা, বাক্য ও কার্যের মধ্যে সংগতি বিধানই ইসলামি জীবনের লক্ষ্য। ইহলৌকিক জীবনে মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর বিধান মেনে চললে পারলৌকিক জীবনে চিরশান্তি লাভ করা যাবে। আর অমান্য করলে পারলৌকিক জীবনে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[১২] তাই মানুষকে পার্থিব জীবনের স্বল্পকালীন সময়ে নৈতিকতার সাথে জীবনযাপন করে অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা করতে হবে। পারলৌকিক জীবনে জবাবদিহিতার বিধান আছে বলেই জীবনের পূর্ণতম বিকাশের মাধ্যমে জীবনের উপলব্ধির জন্য ইসলাম জীবনের বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। আলোচনার সুবিধার্থে নৈতিকতার গুরুত্বকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনব্যবস্থা এই সকল ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

## ব্যক্তিজীবন

ইসলাম দাবি করে যে, ইসলামের বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা ব্যক্তির দায়িত্ব। ব্যক্তিগত দায়িত্ব ইসলামের একটি ভিত্তি। ইসলাম ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ তার সকল কাজের জন্য স্রষ্টার কাছে দায়বদ্ধ। দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ তাকেই দিতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কেউ বহন করবে না অন্যের বোঝা।"[১৩] আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলেন, "তোমরা যদি ভালো কিছু উপার্জন কর, তবে নিজেদেরই ভালো করবে এবং যদি মন্দ কিছু উপার্জন কর তবে তাও নিজেদের জন্যই।" [১৪] "যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।" [১৫] তাই একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো তার নৈতিক চরিত্র। ইসলামে ব্যক্তিগত নৈতিকতার অনেকগুলো দিক রয়েছে। যেমন-সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, পরস্পর সহযোগিতা, সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। ইসলাম মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র শর্ত হিসেবে উত্তম ও পবিত্র চরিত্রকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। মহানবি (সা.) বলেন, "উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের মূল কথা।" [১৬] কেয়ামতের দিন দুনিয়ার ধন-সম্পদ কাজে আসবে না। কাজে আসবে সুন্দর নৈতিক চরিত্র। মহানবি (সা.) বলেন, "কেয়ামতে মু'মিনের দাড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারি জিনিস হবে উত্তম নৈতিক চরিত্র।" [১৭]

মানুষকে নৈতিক দিক থেকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখার ব্যাপারে ইসলাম ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামি বিধান মতে, ভালো কাজের পুরস্কার এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের কঠোর ও কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে," মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব।"[১৮] আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলেন, "যে পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান এবং যে খারাপ কাজ নিয়ে আসবে সে তার কর্ম অনুপাতেই প্রতিফল পাবে।"[১৯] পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "কেউ কোনো পুণ্য কাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজ করলে সে ততটুকুই শাস্তি পাবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।"[২০]। ইসলামে ব্যক্তি পর্যায়ে সততা ও ন্যায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সত্য বলা ও ওয়াদা পালনে সর্বোচ্চ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ঘোষণা হয়েছে, "মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা মহান আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক।"[২১] অর্থাৎ কেবল কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে নৈতিক জীবন গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছে। কথা ও কাজের মধ্যে অমিল ইসলামি নৈতিকতায় একটি অন্যায় কাজ বলেই বিবেচিত।

## পারিবারিক জীবন

ইসলাম মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের প্রবৃত্তিকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পথে পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে। পরিবারভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় মানুষ জীবনকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারে। তাই এ জীবনই সর্বোত্তম জীবন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "আল্লাহ্ যে সকল পুরুষের জন্য যে সকল স্ত্রী লোককে হালাল করেছেন তাদের মধ্যে সে সামর্থানুযায়ী চারজনকে পর্যন্ত বিবাহ

করতে পারবে। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে মাত্র একজনকে বিবাহ করবে। এছাড়া অন্যসব স্ত্রী-ই তার জন্য হারাম করা হয়েছে।"[২২] তবে কেউ যদি মহান আল্লাহ্‌র এই নিয়মকে লঙ্ঘন করে তাহলে পরকালে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে এ রকম পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর জীবনের নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে– "আর নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মালিকানাধীন হয়েছে তাদের ব্যতীত সকল সধবা মহিলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ... আর উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য সব নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো যদি তোমরা অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও।"[২৩]

বিয়ে-শাদির মাধ্যমে সম্মানজনক পন্থায় প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও তা ফলপ্রদ করার পুণ্যময় রীতি প্রণয়ন করেছে শরি'আত। মানব জীবনের কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার জন্যে বিয়ে এক গভীর তাৎপর্যময় সত্য। ইসলামি বিধান মতে, পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানকে পূর্ণ বয়সে বিবাহ দেয়া। এটা সামাজিক দায়িত্বও বটে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত মহানবি (সা.) বলেছেন, "পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত তিনটি: জন্মের পরপরই তার জন্য উত্তম একটি নাম রাখতে হবে, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাকে আল কুরআন তথা ইসলামি শিক্ষা দিতে হবে। আর সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"[২৪] নর-নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে ইসলাম সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে-শাদীর গুরুত্ব অসামান্য। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেছেন, "কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন তো সে দ্বীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।"[২৫]

শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর জীবনব্যবস্থাই কেবল মানুষকে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সুখময় জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। এ ধরনের আইন-কানুন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে নেই।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনব্যবস্থার এতটা ব্যাপক নির্দেশনা নেই। বিশ্বের অনেক দেশেই মুক্ত ও অবাধ যৌন জীবন চর্চা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যভিচার-পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি অনাচার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধে চলছে। কেননা সেসব দেশের পারিবারিক ও সামাজিক সুদৃঢ় বন্ধন নেই। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনও নেই। ইসলামে মুক্ত ও অবাধ যৌনাচার অর্থাৎ ব্যভিচার কবিরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে– "এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[২৬] "(হে রাসুল!) মু'মিনদের বল, তারা যেন তাদের নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"[২৭] যদি তারা এই নির্দেশনা অমান্য করে তাদের শাস্তির বিধান রয়েছে। "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে।"[২৮] আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ী মহানবি (সা.) ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করতেন। বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে তাকে 'রজম' বা প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে ৮০টি কশাাঘাতের শাস্তি দিতেন। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ব্যভিচার চিরতরে উৎখাতের জন্য মহানবি (সা.) বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা ব্যভিচারকে ভয় কর, কেননা তার ছয়টি পরিণাম রয়েছে। তিনটি পৃথিবীতে এবং তিনটি আখিরাতে। পৃথিবীর তিনটি হলো: **১.**

সৌন্দর্যহানি ২. দারিদ্র্য এবং ৩. অকাল মৃত্যু। আর আখিরাতের তিনটি হলো: ১. দোযখের শাস্তি ২. হিসাবে মন্দ পরিণাম এবং ৩. আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" [২৯]

ইসলাম সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠন করার জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" [৩০] মহান আল্লাহ্র পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে সীমার মধ্যে থেকে একজন মুসলমান পার্থিব জীবনে ধর্ম ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে পারলৌকিক জীবনকে সফল করতে পারে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যে সব লোক পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য কামনা করে তাদের কাজকর্মের যাবতীয় ফল আমি দুনিয়াতেই দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নাই, তারা দুনিয়ায় যা কিছু করেছে, তা নিস্ফল হবে এবং তারা যা কিছু করে থাকে তা নিরর্থক।"[৩১]

ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ সাধনে প্রয়াসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্যায় ও অসৎ পথে অগ্রসর হয় তাহলে তার পারলৌকিক শাস্তি ছাড়াও পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমের বিনিময়ে অনুরূপ যখম।"[৩২] এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামে জাগতিক জীবনের পাপ কার্যের যথাযথ শাস্তির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। মানুষ যাতে পার্থিব জীবনে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বেশি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে নৈতিক ও সৎ জীবনযাপনে আগ্রহী হয় এবং পারলৌকিক জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে।

### সামাজিক নৈতিকতা

একটি সুসংগঠিত, সুষ্ঠু সমাজ জীবনযাপনের মাধ্যমেই মানুষ কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারে। একটি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা নির্ভর করে সেই সমাজের প্রতিটি সদস্যের একই নৈতিক নীতি এবং অনুশীলনগুলো মেনে চলার ওপর। সামাজিক নৈতিকতার মধ্যে রয়েছে সমতা, ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, ভ্রাতৃত্ব, করুণা, সহানুভূতি, সংহতি ইত্যাদি। মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালো কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা, সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া আর দুনিয়াতে মহান আল্লাহ্র নৈতিক নীতির বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মানবজাতির সত্যিকার কল্যাণ সাধন করাই ইসলামি সমাজের উদ্দেশ্য। ইসলামে সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠার প্রতি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব আজ চরম অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। সম্পদের অসম বণ্টন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কারণ বিশ্বের ধনী দেশগুলো অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে, আর অপর দিকে অন্য শ্রেণি অর্থের অভাবে অসহায়ভাবে জীবন-যাপন করছে। তাঁরা তাদের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের কোনো ব্যবস্থা করতে পারছে না। আর এর ফলে সমাজে শোষক ও শোষিত দু'টি শ্রেণির উদ্ভব হচ্ছে। ফলে সামাজিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করছে। সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করতে হলে ব্যক্তিমানুষকে নৈতিক হতে হবে, অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। ইসলাম এই দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে

দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে; সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর পুঞ্জীভূত রাখার।"[৩৩] এছাড়া আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "তোমরা অন্যায়রূপে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসন করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিওনা।" [৩৪] সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য ইসলামে যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। একজনের হাতে বিপুল অর্থ-সম্পদ জমা হওয়াকে ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম চায় ধনী-গরীব সবাই স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করুক। তাই দরিদ্রের প্রতি লক্ষ করে যাকাতের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাত গরিবের প্রতি কোন করুনা নয় বরং তার হক– যা ধনী ব্যক্তিকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে বলা হয়েছে– "তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।"[৩৫]

ইসলামি বিধান মতে, যাকাত রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ধনী ব্যক্তিগণ তাদের সম্পদের আড়াই শতাংশ রাষ্ট্রের যাকাত তহবিলে জমা দিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে ইসলামি অনুশাসন না থাকায় কোথাও যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু নেই। যার কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের কোনো ব্যবস্থা নেই এমনকি ব্যক্তি পর্যায়েও যাকাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখা যায়। কিন্তু যাকাত ব্যবস্থা একটি সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও গতিশীলতাকে স্বাভাবিক রাখার নিশ্চয়তা বিধান করে। যাকাত ব্যবস্থা মজুদদারী প্রথার বিলোপ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে। এই ব্যবস্থা অর্থনীতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে ও অর্থনৈতিক শোষণের মুক্তি ঘটাতে সহায়ক হয়। যাকাত দানের ফলে আত্মশুদ্ধি ঘটে, আত্মত্যাগের জন্ম দেয় এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মানসিকতা দূরীভূত হয় ও সম্পদের পরিশুদ্ধি হয়। প্রকৃত পক্ষে যাকাত মানুষকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে মানবতা প্রতিষ্ঠা করে। যাকাত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বা ভারসাম্য রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ব্যবস্থা। এছাড়া যাকাত দানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাঁর রহমত ও আনুগত্য সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, "হিদায়াত ও রহমত সৎকর্ম পরায়নদের জন্য। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখিরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। সেসব লোকই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।"[৩৬]

## বৈষয়িক জীবনে নৈতিকতা

মানুষের বৈষয়িক জীবনের নানা দিকে ইসলাম যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। ইসলাম হালাল পথে উপার্জন ও সঠিক পথে ব্যয়ের নির্দেশনা দিয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো: "আল্লাহ্ ব্যবসাকে (ক্রয়-বিক্রয়) হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারাই জাহান্নামী হবে; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[৩৭] সমাজের এক শ্রেণির মানুষ সুদী কারবারির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সম্পদের পাহাড় গড়ছে। সুদের ফলে

সমাজের কিছু লোক উপকৃত হলেও সুদখোর ব্যক্তির আত্মিক ও নৈতিক বিপর্যয় ঘটছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সমগ্র মানব সমাজের জন্য অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি অর্থনৈতিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হচ্ছে। তাই ইসলাম এই অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনে বিরোধিতা করে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে– "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহর ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।[৩৮]

ইসলাম ব্যবসা ও অর্থ আয়-ব্যয়ের ওপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়া, খারাপ বস্তুকে ভালো বলে বিক্রি করা, দ্রব্যে ভেজাল দেয়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এই নির্দেশনা অমান্যকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক পাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ।"[৩৯] উপার্জিত অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো এরূপ যে, "এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"[৪০] মানুষকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করতে ও অপচয় করতে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। ইসলামে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র, যেখানে সুদ, জুয়া, অন্যায়, অনিয়ম ও বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। তাই সামাজিক পর্যায়ে কোন বৈষম্য থাকবে না। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ আয়-ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ইসলাম মানুষের জীবন গঠনে সহযোগিতা করেছে। অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রেও ইসলাম নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানায়।

## পর্যালোচনা

ব্যক্তি ও সমাজ ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি জাতির উন্নয়নের জন্য তার প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতি যদি সত্যিকার অর্থে নৈতিক চরিত্রে উন্নত না হয় তাহলে সে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে যে সুস্পষ্ট ও অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টির নির্দেশনা প্রদান করেছে তা একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক জীবনব্যবস্থার নির্দেশনা বলা যায়। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে জোর তাগিদ দেয়। কেননা ব্যক্তিজীবনের নৈতিকতার ওপর সামাজিক নৈতিকতা নির্ভর করে। ব্যক্তি নৈতিকতা সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি। ইসলামি নৈতিক আদর্শে যারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তারা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবে না। কেননা তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলে কিছুই থাকবে না। যার কারণে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। ইসলামের নৈতিক উৎকর্ষের কারণেই মুসলমানরা বিশ্বসভ্যতায় বিস্ময়কর অবদান রেখে আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক যুগে মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতার ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে। উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ফলে পাশ্চাত্য জগতের মত অনেকটা স্বেচ্ছাচার, মিথ্যাচার, লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, অপরের অধিকার হরণ ইত্যাদি অসৎ ও অন্যায় পন্থা অবলম্বন করছে। মানুষের মধ্যে কোনো সহনশীলতা নেই যার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। নীতিহীনতার কারণে মানুষ মানবতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মানুষ মুখে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সেমিনারে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সততা ও মানবতার কথা বলে কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ রাখে না।

নৈতিকতাহীন মানুষ অমানবিক ও অপ্রীতিকর কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করছে। তারা মুখে বলছে শান্তির কথা কিন্তু তারাই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আর যখন তাদের বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি।"[৪১] অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সতর্ক করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যে দিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।"[৪২] "সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলেও তাও দেখতে পাবে।"[৪৩] মহান আল্লাহ্তায়ালা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।[৪৪]

মানুষ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ সব সমস্যার কোন সমাধান তারা খুঁজে পাচ্ছে না। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজেদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। পবিত্র কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ্ই মানুষকে দিতে পারে পথের দিশা, যাতে রয়েছে মানুষের জীবনের নানা সমস্যার সমাধান। মহানবি (সা.) এ ব্যাপারে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি, দৃঢ়তার সহিত তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিলে তোমরা কদাচিৎ পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইতেছে আল্লাহ্র কেতাব ও তাঁহার রাসূলের আদর্শ।"[৪৫] সর্বোপরি নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে মানুষ প্রার্থনা করতে পারে। "আল্লাহ সরল পথ দেখাও।"[৪৬] পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নৈতিক শিক্ষার আলোকে মানুষ তাঁর জীবন দর্শনের মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারে যাতে ঐতিহ্যগত ও আধুনিক জীবন ধারার দ্বন্দ্ব এড়ানো যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সংকটগুলোকে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী দূর করা যেতে পারে। নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মানুষের মনন, কর্ম ও ব্যবহারিক জীবন প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তাছাড়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ব্যক্তিজীবনের আদর্শ গড়ে তুলতে মানুষের মধ্যে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা যেতে পারে। কেননা আধ্যাত্মিক বিষয় মানুষকে সৎ করে তুলবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে এবং পরিবারে নৈতিক শিক্ষাকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। সমাজ থেকে অসমতা দূরীকরণে ইসলামি নির্দেশনা অনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যাতে করে একটি সর্বোত্তম নৈতিকতাসমৃদ্ধ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন নিশ্চিত করা যায়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।"[৪৭]

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে গঠন ও পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানে যুগে যুগে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। সকল ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে নানা ধরণের মতভেদ থাকলেও নৈতিকতার ব্যাপারে বেশকিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা যদি তাদের ধর্মের মৌলিক কিছু নৈতিক শিক্ষাকে গভীরভাবে অনুশীলন করে, (যা অন্য ধর্মেও আবশ্যিক করা হয়েছে) তাহলে তা সমাজে সংহতি আনয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামি নৈতিকতা একটি পূর্ণাঙ্গ

জীবনাচরণ প্রদান করে। এই জীবনাচরণ মুসলিমদের জন্য প্রকারান্তরে পালনীয় আদর্শ হিসেবে ইসলাম নির্দেশনা দেয়।

মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ অপরিহার্য। উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। পরকালে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করলে নৈতিকতা অর্জন করা সম্ভব। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ব্যক্তিমানুষ নৈতিকতা অর্জন করলে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র নৈতিকতার আবর্তে আসতে বাধ্য। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে ব্যক্তি নৈতিকতার কথা বলেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিজীবনে একজন মানুষ নৈতিক হলেই রাষ্ট্রে নৈতিকতা তথা ন্যায়বিচার সম্ভব। ইসলামের নৈতিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে না নিয়ে নির্দেশনা পালন, আচার-অনুষ্ঠান ও ইবাদতের সাথে মহান আল্লাহ্‌র ওপর দৃঢ় বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, পর্যাপ্ত বিশ্বাস ছাড়া এসব নৈতিক অনুশীলন এমনকি ইবাদতও মানুষের মুক্তি দিতে পারে না। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ আবুল কাশেম বলেন,

"From the entry into Islam through faith he [the ybeliever] has to make progress and develop the faith through action performed in the light of the Qur'an and Tradition... thus faith and action taken together perfect the life and bring about salvation"[৪৯]

এই বিষয়টি ইসলামি নীতিবিদ্যার একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখানো যেতে পারে। কেননা পর্যাপ্ত বিশ্বাস ছাড়া এই নৈতিকতা অর্থহীন। তবে যেকোনো ধর্মের নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রেই বিষয়টি কমবেশি প্রযোজ্য।

## তথ্যনির্দেশ

১. D. Mial Edward, *The Philosophy of Religion* (India: Progressive Publishers,1993), p.3.

২. এ. কে. এম., শাহনাওয়াজ, *বিশ্বসভ্যতা: প্রাচীন যুগ* (ঢাকা: সূচয়ন প্রকাশন, ১৯৯৩), পৃ. ৫২-৫৪।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-১২৩।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

৫. T. Walter Wallbank and Alastair M.Taylor, *Civilization Past and Present*, (USA: Foreseman and Company, 1962), p. 226-232.

৬. Swami Nikhilananda, translated, *The Bhagavad Gita*,3:19 (USA: The Haddon Craftsmen, Ins.,1944), p.112.

৭. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ, *প্রাগুপ্ত*,পৃ. ১৩৮-৩৯।

৮. নিরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ: তাঁর ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৬) পৃ. ৯৮।

৯. নিরুকুমার চাকমা, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৯৯-১০৩।

১০. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদাস, ১৯৭৮), পৃ. ৯৪-৯৫।

১১. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, *নীতিবিদ্যা* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ.২৮।

১২. *আল কুরআন*, ৩ : ১৮৫।

১৩. *আল কুরআন*, ৬ : ১৬৪।

১৪. *আল কুরআন*, ১৭ : ৭।

১৫. *আল কুরআন*, ৪ : ১২৩।

১৬. *আল হাদিস*, মুসলিম।

১৭. *আল হাদিস*, তিরমিযি।

১৮. *আল কুরআন*, ১৬ : ৯৭।

১৯. *আল কুরআন*, ২৮ : ৮৪।

২০. *আল কুরআন*, ৬ : ১৬০।

২১. *আল কুরআন*, ৬১ : ২-৩।

২২. *আল কুরআন*, ৪ : ৩।

২৩. *আল কুরআন*, ৪ : ২৪।

২৪. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩) পৃ. ৩৪২।

২৫. *আল হাদিস*, মিশকাত: ২৬৮-৩৮৯।

২৬. *আল কুরআন*, ১৭ : ৩২।

২৭. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩০।

২৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ২।

২৯. *আল হাদিস, মুসলিম।*

৩০. *আল কুরআন*, ২ : ১৯০।

৩১. *আল কুরআন*, ১১ : ১৫-১৬।

৩২. *আল কুরআন*, ৫ : ৪৫।

৩৩. *আল কুরআন*, ৯ : ৩৪-৩৫।

৩৪. *আল কুরআন*, ২ : ১৮৮।

৩৫. *আল কুরআন*, ৫১ : ১৯।

৩৬. *আল কুরআন*, ২ : ২৭৭।

৩৭. *আল কুরআন*, ২ : ২৭৫।

৩৮. *আল কুরআন*, ৩ : ১৩০।

৩৯. *আল কুরআন*, ১৭ : ৩৫।

৪০. *আল কুরআন*, ১৭ : ২৬-২৭।

৪১. *আল কুরআন*, ২ : ১১।

৪২. *আল কুরআন*, ৮৬ : ৯-১০।

৪৩. *আল কুরআন*, ৯৯ : ৬-৮।

৪৪. *আল কুরআন*, ২ : ২০৫।

৪৫. *আল হাদিস*, মুসলিম।

৪৬. *আল কুরআন*, ১ : ৫।

৪৭. *আল কুরআন*, ৩ : ১১০।

৪৮. Muhammad Abul Quasem, *Salvation of the soul and Islamic Devotions* (London:Kegan Paul, 1981), p. 35.

জমা প্রদানের তারিখ : ২৩.০২.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৮.২০২৩